ইমাম আবু হানিফার রাজনৈতিক চিন্তাধারা

শামসুল আলম

ইমাম আবু হানিফার রাজনৈতিক চিন্তাধারা

আ. জ. ম. শামসুল আলম

মোহাম্মদ মশিউর রহমান
৫ম বর্ষ, এম. বি. বি. এস
রোল নং-১৩৭, ২৭তম ব্যাচ
এস. এস. এম. সি.
২৮-১১-২০২৩ ইং

৭৬

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইমাম আবূ হানিফার রাজনৈতিক চিন্তাধারা
আ. জ. ম. শামসুল আলম

ইসাকেঢা প্রকাশনা ২২
ইফা বা প্রকাশনা ৪০৮

প্রকাশক ঃ
অধ্যাপক এ. এস. এম. ওমর আলী
সহকারী পরিচালক
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা বিভাগ
বায়তুল মুকাররাম (তেতলা),
ঢাকা-২, বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ মে ১৯৮০
জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ ঃ রজব ১৪০০

প্রচ্ছদ ঃ এম. হক

মুদ্রক ঃ
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশ দাশ লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১

মূল্য ঃ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

IMAM ABU HANIFAR RAJNOITIK CHINTADHARA (Political Thoughts of Imam Abu Hanifa) : written by A. Z. M. Shamsul Alam and Published by Islamic Cultural Centre, Dacca Division, Dacca-2, Islamic Foundation, Bangladesh.

Price : Taka One and paisa fiftyonly.

আমাদের কথা

আমাদের দেশের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী মযহাবভুক্ত। সে-হিসেবে ইমাম আবু হানিফার নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ব্যাপক। বিভিন্ন মসলা-মাসায়েলের ব্যাপারে ইমাম সাহেবের অভিমতের সপক্ষে জোর গলায় সমর্থন জানাতে আমরা কখনও কুন্ঠিত নই। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা যে 'মসলা-মাসায়েল' সম্পর্কে ফতোয়া দেয়া ছাড়াও রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতি বিষয়েও সুচিন্তিত অভিমত দিয়ে গেছেন, এ সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা প্রায় পর্বত-প্রমাণ। ইমাম আবু হানিফার ভক্তেরা, আমরা, অনেকেই খোঁজ রাখি না—তদানীন্তন রাজতন্ত্রী শাসকদের সঙ্গে তিনি এক অসম সাহসিক সংগ্রাম ও সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিলেন ইসলামের সুমহান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শকে উচ্চে তুলে ধরার প্রয়োজনে, এবং এ-জন্যে শাসকদের হাতে তাঁকে নিগ্রহও কম ভোগ করতে হয়নি।

"ইমাম আবু হানিফার রাজনৈতিক চিন্তাধারা" পুস্তিকায় ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও এই বিশিষ্ট সাধক সম্পর্কে একটি ব্যতিক্রমধর্মী আলোচনা স্থান পেয়েছে বলে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই আমরা এই পুস্তিকা প্রকাশে আগ্রহী হয়েছি। আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহ্ কবুল করুন।

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ঢাকা॥ ১৭. ৫. ১৯৮০

আবদুল গফুর
আবাসিক পরিচালক

ইমাম আবু হানিফার রাজনৈতিক চিন্তাধারা

উমাইয়া সুলতান আবদুল মালিকের রাজত্বকালে ৮০ হিঃ (৬৯৯খৃঃ) কুফা নগরীতে ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত (রাঃ) মুসলিম ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন। উমাইয়া, আব্বাসীয় রাজত্বকালে মুসলিম সমাজে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বার্থবাদী ষড়যন্ত্র এবং সাফল্যজনক অগ্রগতির সন্ধিক্ষণে নির্ভীক ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) যুক্তি-তর্কের হাতিয়ার নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় বাস্তব জীবনে সমাজ দেহের বিকৃতি এর অবনতির ধারা রোধ করতে ব্যর্থ হলেও ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) ন্যায় ও সত্যের মশাল দীর্ঘকাল ধরে প্রজ্জলিত রেখেছিলেন।

সার্বভৌমত্ব

ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র, এ মৌলিক নীতিতে কোন বিতর্ক নেই। তবে এ নীতির বাস্তব প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রেই বিতর্ক দেখা যায়। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের রূপায়ণ সম্বন্ধে ইমাম আবু হানিফার (রাঃ) চিন্তাধারা অত্যন্ত সরল এবং সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন, যখন আমি আল্লাহ্‌র কিতাবে কোন সমস্যা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত পাই তখন আমি উহাই মানতে বাধ্য। যদি আমি আল-কুরআনে কোন নির্দেশ না পাই, আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসে তা অনুসন্ধান করি এবং তাই গ্রহণ করি। যখন আমি আল্লাহ্‌র কিতাবে বা হাদীসে কোন নির্দেশ পাই না, তখন আমি সাহাবাগণের (মিলিত সিদ্ধান্ত) অনুসরণ করি। তাঁদের মধ্যে মতভেদ থাকলে যে সিদ্ধান্ত আমার নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হয় তাই গ্রহণ করি এবং যে সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মনে হয় না, তা আমি প্রত্যাখ্যান করি। কিন্তু সবগুলি মত প্রত্যাখ্যান করে গর্হিত কোন মত গ্রহণ করি না। এ ছাড়া অন্যান্যদের ব্যবহারে তাদের ন্যায় আমারও বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসার অধিকার আছে।

রাষ্ট্র পরিচালনা, সামাজিক সমস্যা সমাধান প্রভৃতি যে কোন ব্যাপারে তিনি রসূলের (দঃ) মতামতকে চরম বলে মনে করতেন। সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তিনি যে কোন এক সাহাবীর

মত অনুসরণ করতেন এই কারণে যে, তিনি মনে করতেন যে, সাহাবীদের কারো না কারো রসূলের মতামত জানার অধিকতর সম্ভাবনা ছিল।

আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের ব্যবহারিক অর্থ আল-কুরআন এবং সুন্নায় প্রতিফলিত ইসলামী নীতির সার্বভৌমত্ব। যদি কোন বিষয়ে আল-কুরআনে বা সুন্নায় কোন সিদ্ধান্ত না পাওয়া যায়, তবে ইজমা এবং কিয়াস ও ইজতিহাদের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। ইসলামী আদর্শে প্রগাঢ় পান্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিগণই কিয়াস এবং ইজতিহাদ করবেন, তবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ইজমায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

রাষ্ট্রপ্রধানের যোগ্যতা

মুসলিম নেতাদের মধ্যে ইমাম আবূ হানিফাই সর্বপ্রথম রাষ্ট্র প্রধানের যোগ্যতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। তাঁর মতে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হবেন রাষ্ট্রীয় আদর্শে বিশ্বাসী, ইসলামের জীবন-বিধান সম্বন্ধে পান্ডিত্যের অধিকারী সবল, স্বাস্থ্যবান ও সুস্থ মস্তিষ্কের পুরুষ ব্যক্তি।

আরবী-ফার্সি নাম-সর্বস্ব তথাকথিত মুসলিম হলেই ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর বা প্রধান হওয়া যাবে না। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে কম্যুনিজমে বিশ্বাস করে না, এমন ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে না। কম্যুনিজম, পুঁজিবাদ বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী কোন ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার বা প্রতিনিধিত্বশীল কোনো প্রতিষ্ঠানের সভ্য হতে পারে না। কোন আদর্শবাদী রাষ্ট্রেই আদর্শবিরোধী বা ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে না।

প্রশ্ন উঠে, ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী যে কোন ব্যক্তিই কি ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার উপযুক্ত; যদি সে দুর্নীতিপরায়ণ বা স্বৈরাচারী হয়? ইসলামী আদর্শে পূর্ণ বিশ্বাসী কোন ব্যক্তিই দুর্নীতিপরায়ণ এবং স্বৈরাচারী হতে পারে না। ইমাম আবূ হানিফা (রাঃ) দুর্নীতিপরায়ণ বা স্বৈরাচারী ব্যক্তি খলিফা হওয়ার প্রশ্নে কোন অস্পষ্টতার অবকাশ রাখেন নি। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, কোন দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি খলিফা তো হতে পারেই না; বিচারপতি, মুফতি এমন কি সালিসও হতে পারে না।

ইসলামী রাষ্ট্রে খলিফা বা আমীরের নির্দেশ পালন করা শুধু রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং আইনগত দায়িত্ব ও কর্তব্য নয় উহা নৈতিক

এবং ধর্মীয় কর্তব্য। খলিফার হুকুম অমান্যকারী ব্যক্তি আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি, সে শুধুমাত্র যে এ দুনিয়ায় শাস্তির যোগ্য তা নয়, পরকালে আল্লাহ্‌র বিচারেও সে শাস্তি পাবে। তাকে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আল-কুরআনে আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিয়েছেনঃ "আল্লাহ্‌কে মানো, রাসূলকে মানো এবং তোমাদের মধ্যে যারা আমীর বা হুকুম দেওয়ার অধিকারী তাদের মানো" আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ অমান্যকারী পাপী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী শাস্তির যোগ্য।

যদি কোন দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি ছলে-বলে-কৌশলে বা যে কোন উপায়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, ইমাম আবূ হানিফার (রাঃ) মতে তার খেলাফত বা শাসন বাতিল, মূল্যহীন ও অবৈধ। সে জনগণের আনুগত্য দাবী করতে পারে না। জনগণও তার অনুগত হতে, আদেশ পালন করতে বা নির্দেশ গ্রহণে বাধ্য নয়।

যদি কোন ব্যক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর দুর্নীতিপরায়ণ হয়, তবে সে মুহূর্ত হতে তার খেলাফত বা শাসন অবৈধ এবং বাতিল।

আবূ বকর আল-জাসাস নামে একজন হানাফী ফকিহ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার আইনগত বিধান সম্বন্ধে হানাফী ফেকাহ্‌ বিশ্লেষণ করে বলেন, "ইহা সম্পূর্ণ অবৈধ যে, একজন অত্যাচারী বা দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক বা খলিফা হবে অথবা বিচারপতি হবে অথবা এমন কোন পদে বহাল থাকবে যা দ্বারা সে জনগণের উপর তার মতামত প্রয়োগ করতে পারবে। এরূপ ব্যক্তি মুফতি হতে পারে না, হাদীস বর্ণনাকারী হতে পারে না এমন কি কোন বিবাদ-বিসম্বাদে তার সাক্ষ্যও গ্রহণীয় হতে পারে না।

আল-কুরআনে আছে,'আমার প্রদত্ত ক্ষমতা অন্যায়কারী প্রয়োগ করতে পারে না।' এ আয়াতে এটা স্পষ্ট যে ক্ষমতার রজ্জু যারা ধারণ করবে তাদেরকে হতে হবে সৎ, পুণ্যবান এবং ন্যায়পরায়ণ। এই আয়াত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে 'দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির খেলাফত বেআইনী।'

"যার কোন দুর্নাম আছে সেরূপ ব্যক্তি খলিফা হতে পারে না। যদি সেরূপ ব্যক্তি ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে অনুসরণ করা জনগণের কর্তব্য নয়। রসূল (সাঃ) সে অর্থেই বলেছেন, আল্লাহ্‌কে অমান্য করে কারও হুকুম দেওয়ার অধিকার নেই।

উপরে বর্ণিত আয়াতে দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি বিচারপতি, আমীর অথবা শাসক হতে পারে না, যদিও সে কোনক্রমে অনুরূপ পদ অধিকার করে তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণীয় হবে না, তার বর্ণিত হাদিস বিশ্বাস্য হবে না, তার প্রদত্ত ফতওয়া অনুসরণীয় হবে না।

বলপূর্বক ক্ষমতা দখল

বলপূর্বক ক্ষমতা দখল এবং ভীতি প্রদর্শন করে আনুগত্য আদায় ইমাম আবু হানিফার (রাঃ) মতে বৈধ নয়। তাঁর মতে খলিফা বা আমীরকে অবশ্যই জনগণের শ্রদ্ধাভাজন, সুবিবেচক ব্যক্তিদের দ্বারা মনোনীত বা নির্ধারিত এবং জনগণ দ্বারা গৃহীত হতে হবে।

এ প্রসঙ্গে হযরত উমরের (রাঃ) মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন, "যারা বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করে এবং বলপূর্বক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে তাদেরকে এবং সমর্থকগণকে হত্যা করো।" ইসলামে বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করা সব সময়ে অন্যায়। জালেম এবং অত্যাচারী শাসককে বিতাড়নের আইনসঙ্গত বিধান না থাকলে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব করার অধিকার ইসলাম দিয়াছে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর এরূপ ব্যক্তিকে অবশ্যই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য আদায় করতে হবে। বিক্ষুব্ধ জনগণের উপর কর্তৃত্ব করার কোন অধিকার ইসলাম কোন শাসককে প্রদান করে নি।

অত্যাচারী আব্বাসীয় সুলতান মুনসুরের উজির রাবি বিন ইউনুস বর্ণনা করেছেন যে, সুলতান মনসুর একদিন সে যুগের তিনজন প্রগাঢ় পান্ডিত্বের অধিকারী ব্যক্তি ইমাম মালিক (রাঃ) (মালেকী মাজহাবের ইমাম মালিক বিন আনাস নন), ইবনে আবি দিব (রাঃ) এবং আবু হানিফাকে (রাঃ) শাহী দরবারে সমন দেন। তাঁদেরকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "আল্লাহ্ আমাকে জনগণের উপর যে ক্ষমতা দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আপনাদের কি অভিমত? আমি কি এই ক্ষমতার জন্য যোগ্য?"

ইমাম মালিক (রাঃ) জবাব দেন, "আপনি যোগ্য না হলে আল্লাহ্ আপনাকে এই ক্ষমতা অর্পন করতেন না।"

ইবনে আবি দিব (রাঃ) বলেন "আল্লাহ্ এই দুনিয়ার কর্তৃত্ব যাকে ইচ্ছা তাকে দেন কিন্তু তিনি পরকালে কর্তৃত্ব তাকেই দেন যে উহার জন্য সাধনা করে, সংগ্রাম করে আর তাকে আল্লাহ্ উহা অর্জন করতে

সাহায্য করেন। আপনি যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসরণ করেন, আল্লাহ্‌র সাহায্য আপনার উপর বর্ষিত হবে। যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করেন, আল্লাহ্‌র সাহায্য হইতে বঞ্চিত হবেন।

"খেলাফত সম্বন্ধে সত্য কথা এই যে, একমাত্র ধর্মভীরু এবং পরহেজগারদের সম্মেলনই খলিফা নির্বাচিত করতে পারে। যে উহা বলপূর্বক দখল করে তার মধ্যে কোন ন্যায়নিষ্ঠা নেই।

"আপনি আপনার সমর্থকগণ সত্য-পথভ্রষ্ট এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য হতে বঞ্চিত। এখন যদি আপনি শান্তির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সর্বদা প্রার্থনা করেন, আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনে সর্বদা চেষ্টা করেন, মহৎ কাজে নিযুক্ত থাকেন, আল্লাহ্ আপনাকে অনুগ্রহ করতে পারেন; নচেৎ আপনি একজন আত্মসর্বস্ব এবং ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তি ছাড়া কিছুই নন।"

ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি ইবনে আবি দিবকে (রাঃ) এই কথাগুলো বলতে শুনলেন, তখন তিনি এবং মালিক দু'জনেই তাদের লম্বিত জোব্বা গুটিয়ে নেন। কেননা, তারা ভয় করছিলেন যে, যে কোন মুহূর্তে ইবনে আবি দিবের (রাঃ) মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে এবং তাদের জোব্বায় রক্ত ছিট্‌কে পড়তে পারে। কিন্তু সুলতান মনসুর তেমন কিছু করলেন না, তিনি তরবারি নিষ্কোষিত করলেন না।

সুলতান মনসুর ইমাম আবু হানিফার (রাঃ) দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার কি অভিমত ?"

ইমাম আবু হানিফা জবাব দিলেন, "যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে সত্যপথ অন্বেষণ করে সে ক্রোধ পরিহার করে চলে।"

"আপনি যদি আপনার বিবেককে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি অনুভব করবেন যে, আমাদেরকে সত্যানুসন্ধানে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ডেকে আনেননি। আপনার প্রকৃত অভিলাষ এই যে আমাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে এমন কিছু বলবেন যাতে আপনার স্বার্থ রক্ষিত হয় এবং জনগণের মধ্যে প্রচার করতে পারবেন।"

"আসল সত্য এই যে, যারা নির্ভরযোগ্য ফতওয়া দিতে পারেন এরূপ দুটি লোকেরও সম্মতি নিয়ে আপনি খলিফা হননি। অথচ খলিফা নির্বাচিত হবে জনগণের সম্মেলনে এবং সম্মতি দ্বারা।"

"আপনার জানা উচিত যে, ইয়ামেনীদের আনুগত্যের সংবাদ না আসা পর্যন্ত খলিফা আবুবকর (রাঃ) ৬ মাস পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন।"

অতঃপর তিনজন পণ্ডিতই আসন পরিত্যাগ করে দরবার হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

তিনজন পণ্ডিতের আন্তরিকতা পরীক্ষা করে দেখার রাজকীয় খেয়াল হলো আব্বাসীয় সুলতান মনসুরের। তিনি রাবী বিন ইউনুসকে থলিপূর্ণ অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা সহ তিনজনের নিকট গমনের হুকুম দিলেন। তাকে নির্দেশ দেওয়া হলো—যদি ইমাম মালিক তা গ্রহণ করতে চায় তবে স্বর্ণমুদ্রা যেন তাকে অর্পন করা হয়। আর যদি ইমাম আবূ হানিফা বা ইবনে আবি দিব স্বর্ণমুদ্রার থলি গ্রহণ করে তবে যেন তাদের খন্ডিত মস্তক সুলতানের নিকট আনয়ন করা হয়।

যখন স্বর্ণমুদ্রার থলি ইমাম মালিককে দেওয়া হলো তিনি তা সবিনয়ে গ্রহণ করলেন।

অতঃপর রাবি বিন (রাঃ) ইউনুস স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলি নিয়ে ইবনে আবি দিবের নিকট গমন করেন এবং সুলতান প্রদত্ত উপঢৌকন গ্রহণের অনুরোধ করেন।

ইবনে আবি দিব (রাঃ) বলেন, "যা আমি মনসুরের নিজের জন্যে হালাল মনে করি না, তা কি করে আমার জন্যে হালাল হতে পারে ?" তিনি স্বর্ণমুদ্রাগুলো ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

ইমাম আবূ হানিফা (রাঃ) রাবি বিন ইউনুসকে বলেন, "আমি এ স্পর্শ করতে পারি না, এমনকি আপনি যদি এজন্যে আমার মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন তবুও না।"

ইমাম ইবনে আবি দিব এবং আবূ হানিফার (রাঃ) প্রতিক্রিয়া এবং স্বর্ণমুদ্রা প্রত্যাখ্যানের খবর পেয়ে সুলতান মনসুর মন্তব্য করেন, "আত্ম-সন্তুষ্টি তাদের জীবন রক্ষা করেছে।"

অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

বিদ্রোহ, ফেৎনা-ফাসাদ ইসলামে নিষিদ্ধ। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তিত হবে এটাই সর্ববাদী স্বীকৃত সিদ্ধান্ত। যেহেতু বিদ্রোহ নিষিদ্ধ এবং নিন্দিত করা হয়েছে তাই অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করা সংগত কিনা এ সম্মন্ধে ফকিহদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল।

কোন কোন হাদীস শাস্ত্রবিদ মনে করতেন যে, স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে কথা বলা বা প্রতিবাদ করা এবং বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তোলা যেতে পারে। কিন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করা উচিত নয়, যদিও রাষ্ট্রপ্রধান

জনগণের অধিকার খর্ব করে, সীমা লঙ্ঘন করে অথবা রক্তপাত ঘটায়। এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানিফার (রাঃ) মতামত অত্যন্ত দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট।

ইমাম আবূ হানিফা (রাঃ) মতে অত্যাচারী শাসকের শাসন বা খেলাফত আইনতঃ অবৈধ। তাই রাষ্ট্রপ্রধানকে বলপূর্বক অপসারণ করাই কর্তব্য। তার মতে এরূপ রাষ্ট্রপ্রধানকে বলপূর্বক অপসারণে জনসাধারণের যে শুধুমাত্র অধিকার আছে তা নয়; বরং সশস্ত্র বিদ্রোহ করা জনগণের অবশ্য করণীয় কর্তব্য। এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্রোহ শুধুমাত্র সঙ্গত নয়, ফরজ। তবে ইমাম আবূ হানিফা (রাঃ) এ বিদ্রোহের ব্যাপারে দুটি শর্ত আরোপ করেছেন। এ বিদ্রোহ সফল হওয়ার সম্ভবনা থাকতে হবে। বিদ্রোহ যেন ব্যর্থ অভ্যুত্থান, অথবা রক্তপাত, শক্তিক্ষয় এবং বিশৃঙ্খলতায় পর্যবসিত না হয়; দ্বিতীয়ত, এ বিদ্রোহের মাধ্যমে অত্যাচারী এবং স্বেচ্ছাচারী শাসককে অপসারণ করে ন্যায়পরায়ণ, যোগ্য এবং কল্যাণকর শাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকতে হবে। শুধুমাত্র নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যক্তি বিশেষকে অপসারণের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ সঙ্গত নয়।

সরকার কর্তৃক অর্থ অপচয়

সমকালীন অন্যান্য রাজা-বাদশাহের ন্যায় আব্বাসীয় এবং উমাইয়া সালতানাতের আমলেও সুলতানগণ বিলাস জীবন-যাপন করতেন এবং অযথা অর্থ অপচয় করতেন। ইসলামী রাষ্ট্রে খলিফার জীবন যাত্রার মান রাষ্ট্রের দরিদ্রতম নাগরিকের জীবন-যাত্রার মান হতে উন্নত হতে পারে না। রাষ্ট্রপ্রধান মুসলিম রাষ্ট্রের জনগণের সর্বাপেক্ষা অনুগত, বিশ্বাসী, একনিষ্ঠ কর্মচারী বা চাকর। কোন খাদেমেরই জীবন-যাত্রার মান মনিবের জীবন-যাত্রার মান হতে উন্নত হতে পারে না—যদি সে খাদেম চোর বা ডাকাত না হয়। মনিবের জ্ঞাতসারে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনিবের সাধ্যাতিরিক্ত অর্থ বেতন ভাতা ইত্যাদি বাবত গ্রহণ করা ডাকাতি ছাড়া কি হতে পারে? মনিবকে ভুখা রেখে খাদেমের প্রাসাদপম অট্টালিকায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রকোষ্ঠে এক ইঞ্চি পুরু কোমল মূল্যবান গালিচায় পদ স্থাপন করে সেবা করার মানসিকতা প্রকাশের জন্যে 'ডাকাতি' শব্দটিও বোধ হয় যথেষ্ট নয়।

শাসকগণ কর্তৃক জনসাধারণ হতে আদায়কৃত অর্থের অপচয় ইমাম আবূ হানিফার (রাঃ) মতে ছিল অমাজর্নীয় অপরাধ। আল-দাহামী উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবূ হানিফা মনে করতেন যে, বিলাসী এবং

অর্থ অপব্যয়কারী শাসক খেলাফতের অযোগ্য। তার প্রদত্ত নির্দেশ প্রতিপালন করা জনগণের কর্তব্য নয়, কারণ খলিফার পদে তার কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার নেই।

বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য খলিফার নামে যে সমস্ত ছোট-খাট উপঢৌকন প্রেরিত হতো তাতেও রাষ্ট্রপ্রধানের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে বলে ইমাম আবূ হানিফা মনে করতেন না। তাঁর মতে এসবগুলো বায়তুল মালে জমা দেওয়া রাষ্ট্রপ্রধান এবং অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য। কারণ রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং কর্মচারী হওয়ার জন্যই ঐ সমস্ত বস্তু উপঢৌকন-স্বরূপ অর্পন করা হয়, রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক উপঢৌকন অথবা দান খয়রাতেও ইমাম আবূ হানিফার প্রবল আপত্তি ছিল। এজন্যই তিনি কোন সুলতান হতে দান গ্রহণ করেন নি।

বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথকীকরণ

উমাইয়া এবং আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করার জন্যে ইমাম আবূ হানিফাকে (রাঃ) বারবার অনুরোধ করা হয় এবং চাপ দেওয়া হয়। কিন্তু বারবারই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধান বিচারকের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে ইমাম আবূ হানিফার ধারণা নিম্নরূপ ঃ—পদ মর্যাদার দিক হতে প্রধান বিচারপতির স্থান রাষ্ট্রপ্রধানের অব্যবহিত পরেই; রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতিকে বিশেষ বিশেষ কারণে অপসারণ করতে পারেন, কিন্তু বিচারপতি স্বীয় পদে সমাসীন থাকাকালে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। বিচারকের রায় রাষ্ট্রপ্রধান মেনে চলতে বাধ্য। খলিফা যদি জনগণের অধিকার খর্ব করে, তবে খলিফাকে আদালতের রায় মেনে নিতে বাধ্য করার মতো শক্তি এবং সামর্থ বিচারপতির থাকতে হবে।

চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর (রাঃ) খেলাফতকালের একটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে হযরত আলীর একটি বর্ম সিকন্দরের যুদ্ধে হারিয়ে যায়। পরে তিনি সে বর্মটি এক ইহুদীর কাছে দেখতে পান। দেখেই তিনি তার বর্মটি চিনিতে পারেন। শারীরিক শক্তির দিক দিয়ে তিনি অবশ্যই উক্ত ইহুদী হতে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। তদুপরি তিনি খলিফা। হয়ত জোর করে বর্মটি নিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু খলিফা হযরত আলী (রাঃ) তা করলেন না। তিনি কাজীর দরবারে নালিশ করলেন। ইহুদী অভিযোগ অস্বীকার করে। যেহেতু বর্মটি ইহুদীর দখলে ছিল, প্রমাণের দায়িত্ব তখন পড়ে অভিযোগকারীর উপর।

কাজী খলিফাকে সাক্ষী হাজির করতে নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রাঃ) সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য হাজির করলেন ভৃত্য কাম্বর এবং পুত্র হাসানকে। তারা দুজনেই বর্মটি চিনতেন এবং সনাক্ত করলেন। কিন্তু দু'টি সাক্ষ্যই অগ্রাহ্য হলো। কারণ পিতার মামলায় পুত্রের সাক্ষ্য, মনিবের মামলায় ভৃত্যের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়; সত্যবাদী বলে তাদের সুনাম থাকলেও। মুসলিম রাষ্ট্রে খলিফা নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী। মহান খলিফা স্বীয় অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হলেন, মামলায় হেরে গেলেন।

আইনের সম্মুখে মুসলিম রাষ্ট্রে প্রধানের অসহায়তা এবং ইসলামের নিরপেক্ষ বিচার পদ্ধতি দেখে উক্ত ইহুদি মোহিত হয়ে যায়। কাজীর সম্মুখেই খলিফার নিকট অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষা করে বর্মটি খলিফাকে ফিরিয়ে দেয়। এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

উমাইয়া ও আববাসীয় সালতানাতে কাজীর এরূপ স্বাধীনতা ছিল না যে, তিনি সুলতানকে তার সিদ্ধান্ত পালনে বাধ্য করেন। শুধু সুলতান নয়, সুলতানের পরিবারবর্গ, আমীর ওমরাগণও বিভিন্ন উপায়ে বর্তমান সময়ের ন্যায় বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করত এবং বিচারের রায় ক্রয়-বিক্রয় করত। এরূপ পরিস্থিতিতে খলিফার পক্ষে নিরপেক্ষ বিচার করা সম্ভব ছিল না। প্রধান বিচারকের পদ গ্রহণ করে সুলতানদের তরে সিদ্ধান্ত প্রয়োগ ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন বলে ইমাম আবু হানিফা আববাসীয় সুলতানদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন নি।

বাক-স্বাধীনতা

ইসলামী রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনই সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। রাষ্ট্রপ্রধানের শুধুমাত্র রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি ঘটনার সমালোনা করার অধিকার যে কোন ব্যক্তির থাকবে।

জনগণের কন্ঠ রুদ্ধ করার অধিকার ইসলাম কোন শাসককে দেয়নি। কিন্তু শাসক এবং জালিমের কার্যাবলী আলোচনা করা গিবতের পর্যায়ে পড়ে না। শাসকের বিরুদ্ধে যায় বলেই কোন ব্যক্তির কন্ঠরোধ করার অধিকার কারও নেই।

হজরত আলীর (রাঃ) খেলাফতকালে পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে খলিফার সম্মুখে আনয়ন করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ—

তারা প্রকাশ্য রাস্তায় খলিফাকে গালিগালাজ করেছে, কাল্পনিক অভিযোগ এনেছে, দুর্ণাম রটিয়েছে এবং তাদের একজন খলিফাকে হত্যা করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে। অভিযোগগুলি শুনে হজরত আলী (রাঃ) অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মুক্তি দিয়ে দেন।

জনৈক সহচর আপত্তি জানিয়ে খলিফাকে বললো, "তারা তো আপনাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করেছে।" হজতর আলী (রাঃ) জবাব দেন, "তারা আমায় হত্যা করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে বলেই কি আমি তাদেরকে শাস্তি দিব ?"

তা'কে বলা হলো ঃ- "তারা তো আপনাকে গালাগালি করেছে। হজরত আলী (রাঃ) বললেন," তোমার যদি ইচ্ছা হয় তুমিও তাদেরকে শুধুমাত্র গালি দিতে পার।

উপরিউক্ত ঘটনার বরাত দিয়ে ইমাম আবু হানিফা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, রাষ্ট্রপ্রধানের সমালোচনার অপরাধে তার কর্মের প্রতিবাদে তাকে গালাগালি করার এমনকি তাকে হত্যা করার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেও কাউকে কারারুদ্ধে করা আইনসঙ্গত হবে না।

ইমাম আবু হানিফার (রাঃ) মতে কোর্ট আদালতও সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। বর্তমান সময়ে কেউ কোর্টের সমালোচনা করলে তাকে আদালত অবমাননার দায়ে অপরাধী হতে হয়। তখনকার দিনের আদালতের অন্যায় সিদ্ধান্তের সমালোচনা আবু হানিফা (রাঃ) স্বয়ং করেছেন। তিনি কোর্টের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছেন; আদালতের রায়ের আইনগত ত্রুটি তিনি উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু হানিফার (রাঃ) মতে আদালতের মর্যাদার অর্থ এ নয় যে, আদালতের অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না। আদালতের রাজপুরুষ প্রভাবিত রায়ের তীব্র সমালোচনা করার অপরাধে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁর উপর ফতওয়া দান সম্পর্কে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন সময়ে শাসকদের অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছেন, সমালোচনা করেছেন এবং জনগণের সমালোচনা করার অধিকারের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

ইমাম আবু হানিফার (রাঃ) মতে বাক-স্বাধীনতা শুধুমাত্র জনগণের অধিকার নয়, সমালোচনা করা এবং ত্রুটি প্রদর্শন করা জনগণের কর্তব্য। আল-কুরআনের পরিভাষায় বাক-স্বাধীনতা হলো, আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার, ভালো কাজের আদেশ দিতে হবে এবং

খারাপ কাজ নিষেধ করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তিরই থাকবে। এটা আল্-কুরআনের নির্দেশ; এ অধিকার হতে জনগণকে বঞ্চিত করার অধিকার কারও নেই। এমন কোন আইন যদি প্রণয়ন করা হয় যাতে ব্যক্তির খারাপ কাজে নিষেধ করার অধিকার থাকবে না তা অনৈসলামিক এবং ইসলামী রাষ্ট্রে এরূপ আইন বাতিল এবং অবৈধ।

অনৈসলামিক সরকারের অধীনে চাকুরী

উমাইয়া-আব্বাসীয় আমলে রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র ছিল না। সেটা ছিল মুসলিম রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রে ইসলামী আইন-কানুন প্রচলিত এবং যে রাষ্ট্রে আল্-কুরআন এবং সুন্নাহ বিরোধী আইন অবৈধ এবং বাতিল সেটাই ইসলামী রাষ্ট্র। কোন রাষ্ট্র মুসলিম অধ্যুষিত হলেই তা ইসলামী রাষ্ট্র হয় না। মুসলিম অধ্যুষিত বা মুসলিম জনগণের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিচালিত রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্র।

ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) অনৈসলামিক রাষ্ট্রের হুকুমতের অধীনে কোন চাকুরী গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করতেন না। উমাইয়া এবং আব্বাসীয় সুলতানগণ সাম্রাজ্যের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সমকালীন মহৎ এবং প্রভাবশালী জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করতে বাধ্য করতেন। ইমাম আবু হানিফাকে বার বার গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয় কিন্তু প্রত্যেক বারই তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

কুফার উমাইয়া বংশীয় আমীর ইয়াজীদ বিন উমর বিন হুবাইরা তৎকালীন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ইবনে আবু লায়লা, দাউদ বিন আবি আল-হিন্দ ইবনে শুবরুমা এবং অনান্য অনেককে অত্যন্ত লোভনীয় পদে নিযুক্ত করেন। তিনি ইমাম আবু হানিফাকে উমাইয়াদের অধীনে তাঁর ইচ্ছামত যে কোন চাকুরী গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) ঘৃণাভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তিনি উমাইয়া আমীর ইয়াজিদ বিন উমর বিন হুবাইরা কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। তাঁকে চাবুকাঘাতেও ভীতি প্রদর্শন করা হয়।

অপরাপর জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিগণ ইমাম আবু হানিফার (রাঃ) নিকট তাঁকে নিজের প্রতি দয়াপ্রবণ হতে আবেদন করেন এবং বলেন যে, উমাইয়াদের অধীনে চাকুরী, তাঁদের জন্য বিষতুল্য তবুও তাঁরা বাধ্য হয়ে সে চাকুরী গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেন, যদি ইয়াজিদ বিন উমর আমাকে আল-ওয়াসিকের মসজিদের দরজাগুলি গণনা করার

জন্য আদেশ করেন তাও আমি তার নির্দেশের জন্য করব না। তাহলে কি করে আমি সম্মত হতে পারি যে নির্দোষ লোকের মৃত্যু পারোয়ানা সে লিখবে আর আমি তার উপর সিলমোহর অংকিত করব। আল্লাহর কসম! আমি তার পাপাচার এবং দায়িত্বের ভাগী হতে চাই না।

বিভিন্ন সময়ে ইমাম আবু হানিফাকে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণে অনুরোধ জানান হয় কিন্তু তিনি স্বীকৃত হননি। পরবর্তীকালে আমির ইয়াজিদ বিন উমর ইমাম আবু হানিফাকে কুফার প্রধান কাজীর পদ অলংকৃত করতে প্রস্তাব করেন। আমির প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি আবু হানিফা (রাঃ) এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তবে তিনি অবশ্যই তাকে চাবুকাঘাতে জর্জরিত করবেন।

ইমাম আবু হানিফা এ প্রস্তাব পূর্বের ন্যায় প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, "এ-দুনিয়ার চাবুকাঘাত পরজগতের চাবুকাঘাত হতে অধিক আরামপ্রদ।" তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, অত্যাচারী শাসকের অধীনে চাকুরী তিনি করতে পারেন না তাতে যদি তার প্রাণ বিয়োগও ঘটে।

উমাইয়া আমির ইয়াজিদ বিন উমর একজন নিঃসম্বল পণ্ডিত ব্যক্তির এই স্পর্দ্ধা সহ্য করতে পারলেন না। ইমামের উপর তার দণ্ডাদেশ নেমে আসে। তিনি আবার কারারুদ্ধ হলেন, শুরু হলো তাঁর উপর নৃশংস অত্যাচার ও নিপীড়ন। প্রতিদিন তাঁর পবিত্র শিরে দশটি করে চাবুকাঘাত শাস্তি প্রদত্ত হলো। মস্তকে চাবুকাঘাতের ফলে অসহ্য বেদনা সত্ত্বেও তিনি স্বীয় সিদ্ধান্তে অনড়, অটল রইলেন। এগার দিন পর্যন্ত নৃশংস অত্যাচার হতে থাকে তাঁর উপর।

এগার দিন পর্যন্ত নৃশংস শারীরিক অত্যাচারের ফলে ইমাম আবু হানিফার (রাঃ) অন্তিম দশা ঘনিয়ে আসে। আমির ইয়াজিদ বিন উমর খবর পেলেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) মৃত্যু পথ-যাত্রী। আমির আক্ষেপ করে বলেন, "এমন কি কেউ নেই যে, এ ব্যক্তিকে পরামর্শ দেয় যে, সে আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে বা আমার নির্দেশ পালন করে?"

ইমাম আবু হানিফাকে আমীরের মনোভাব জানান হলো, তিনি শুনে বললেন,—"তাকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়। যাতে তিনি যেন শুভাকাঙ্খীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দেখতে পারে।" আমীর ইয়াজিদ তাকে কিয়ৎকালের জন্যে কারামুক্তির আদেশ দেন। রাতের অন্ধকারে তিনি মক্কার পথে কুফা ত্যাগ করেন। উমাইয়া বংশের পতনের পর তিনি কুফায় ফিরে আসেন।

উমাইয়া সালতানাতের পতনের পর আব্বাসীয় সুলতান উমাইয়া বংশীয়দেরকে অকাতরে হত্যা করতে থাকেন। ইমাম আবু হানিফা এ হত্যাযজ্ঞের তীব্র প্রতিবাদ করেন; এমন কি তিনি আব্বাসীয় সুলতান মনসুরের বিরুদ্ধে নফস-আজ জাকিয়া এবং তদীয় ভ্রাতা ইব্রাহিমের বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন। এ জন্য খলিফা মনসুর ছিলেন ইমাম আবু হানিফার প্রতি ক্রোধে অগ্নিশর্মা। কিন্তু তিনি ইমাম আবু হানিফাকে প্রকাশ্যে কতল করতে সাহসী হয়নি। কারণ বাস্তব বুদ্ধি-সম্পন্ন মনসুর জানতেন হজরত ইমাম হোসেনের (রাঃ) হত্যা উমাইয়া বংশের পতনের কারণ হয়েছিল।

সুলতান মনসুর ইমাম আবু হানিফাকে কোনরূপ শাস্তি না দিয়ে তাঁকে অর্থ এবং পদমর্যাদার লোভ দেখিয়ে সালতানাতের ইজ্জত বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। তাই সুলতান মনসুর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ এবং তৎপর আব্বাসীয় সালতানাতের কাজীউল কুযযাতের পদ গ্রহণের জন্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বিভিন্ন অজুহাতে ঐ পদ প্রত্যাখ্যান করেন।

একবার ইমাম আবু হানিফা খলিফা মনসুরকে বলেন, "যদি আমি কাজীউল কুযযাতের (প্রধান বিচারপতি) পদ গ্রহণ করি তাতে আপনার উদ্দেশ্য সফল হবে না। কারণ, যদি আমি কোন বিষয়ে আপনার স্বার্থ এবং আকাঙখার বিরুদ্ধে কোন রায় দেই আর আপনি সে রায়ের পরিতর্বন করতে চান তা হবে না, এমনকি যদি আপনি আমাকে ফোরাতের পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করতে সিদ্ধান্ত করেন তবুও আমি ফোরাতে ডুবে মরতেই সানন্দে স্বীকৃত হবো, কিন্তু আমার রায় পরিবর্তন করব না।"

ইমাম আবু হানিফাকে আব্বাসীয় সালতানাতের স্বার্থে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়ে সুলতান মনসুর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তাঁকে জিন্দান-খানায় বন্দী করে চাবুকাঘাতে জর্জরিত করা হয়। কয়েদখানায় তাঁকে দিনের পর দিন কোন খাদ্য এবং পানীয় না দিয়ে ভুখা ও পিপাসার্ত রাখা হতো। পিপাসায় জর্জরিত করে জনগণের অলক্ষ্যে ক্রমশঃ তাঁকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া হয়।

জঠর জ্বালার কঠোর দহনে দগ্ধ হয়েও তিনি ইসলামী আদর্শ বিগর্হিত শাসনব্যস্থার অধীনের কোন চাকুরী গ্রহণে স্বীকৃত হননি। কয়েদখানায় আলো-বাতাসহীন ক্ষুদ্র সেলের মধ্যে অন্তিমকালে আত্মীয়-পরিজনের স্নেহ-দৃষ্টি বঞ্চিত, চাবুকাঘাতে জর্জরিত, জীর্ণদেহ,

সত্যের সাধক আবু হানিফা ভুখ-পিপাসাকে সাথী করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (১৫০ হিঃ)। অমানুষিক শারীরিক অত্যাচার তো ছিলোই, তদুপরি মুসলিম বিশ্বের এই বিস্ময়কর প্রতিভার শাহাদাতের অন্যতম কারণ ছিল তদানিন্তন অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নির্জন প্রকোষ্ঠে বিষ প্রয়োগ। একদিকে তাঁর মৃত্যু যেমন মর্মান্তিক অপরদিকে মুসলিম অধ্যুষিত অনৈসমলাকি রাষ্ট্রে মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর হাতে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলনে নিয়োজিত সংগ্রামী কর্মীদের নিশ্চিত পরিণতির স্বাক্ষর। যুগে যুগে তাঁর এই বলিষ্ঠ আত্মত্যাগ সংগ্রামী কর্মীদেরকে হাসি মুখে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নৃশংস অত্যাচার, অমানুষিক দুঃখ-বেদনা, ব্যথা-যাতনা বরণ করে নিতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাবে।

গ্রন্থ-সূচী ঃ

১। আল-কুরআন ঃ২ঃ১২৪।

২। আল-মোয়াফফাক বিন আহমাদ আল-মাক্কিঃ মানাকিব আল ইমাম আল-আজম আবি হানিফা, দায়ারাতুল মারিফ, হায়দ্রাবাদ ১৩২১ হিঃ ১৯০৩ খৃঃ
ভলুম ১ পৃঃ ১৬২
ভলুম ২ পৃঃ ১০০, ২১-২৪, ৭২, ১৭৩, ১৭৮, ১৭০, ১৭৪ ১৮২

৩। আল-কারদারীঃ মানাকিব আল-ইমাম আল-আজম, দায়রাতুল মারিফ হায়দ্রাবাদ ১৩২১ হিঃ, ১৯০৩ খৃঃ।
ভলুম ১ পৃঃ ৩০, ১৬০, ১৬৫, ১৬৬
ভলুম ২ পৃঃ ১৫, ১৬।

৪। ইবনে আবি আল ইজ আল-হানাফি ঃ শারহ আল-তাহাবিয়্যাহ, দার আল-মারিফ, মিশর ১৩৭৩ হিঃ ১৯৫৩ ইং পৃঃ ৪০৩।

৫। আল-দাহাবি ঃ মানাবিক আল-ইমাম আবু হানিফা ওয়া সাহিবাইহি, দার আল কুতুব আল আরাবি, মিশর ১৩৬৬ হিঃ ১৯৪৬ পৃঃ ১৭, ২১।

৬। আল সারানী : কিতাব আল-মিজান
মাতবাত আল-আজহারিয়্যাহ, মিশর, ১৯২৫ খৃঃ ভল্যুম ১ পৃঃ ৬১।

৭। আল সারাকসী : শাহর আল সিরিয়া আল কবির শিরকাহ মুসামাহ মিসরিয়া মিশর ১৯৫৭ খৃঃ ভল্যুম ১ পৃঃ ১৮।

৮। আল-জাসসাস : ভল্যুম ১ পৃ ৮০।

৯। ইবনে আবদ আল বার : আল-ইনতিকা আল-মাকতাবাত আল-কুদসি, কায়রো ১৩৭০ হিঃ, ১৯৫০ খৃঃ
ভল্যুম ১ পৃঃ ১৫২, ১৫৩, ১৭১
ভল্যুম ২ পৃঃ ৪৬৭

১০। আল-ইয়াফি : মিরাত আল-জিনান ওয়া ইবরাত আল-ইয়াক-জান : দায়রাতুল মারিফ, হায়দ্রাবাদ ১৩৩৭ হিঃ ১৯১৮ ইং ভল্যুম ১ পৃঃ ৩১০

১১। আল-খাতিব : ভল্যুম ১৩ পৃঃ ৩২৮, ৩৫১

১২। আহকামুল কুরআনঃ ভল্যুম ১ পৃঃ ৮১

১৩। আল-আশারী ভল্যুম ২ পৃঃ ১২৫

১৪। ইবনে খাল্লিকান : ভল্যুম ৫ পৃঃ ৪১, ৪৬, ৪২২, ৪২৩।

ইসলামী সাংস্কৃ[illegible]